OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 76
Website: https://tirj.org.in, Page No. 691 - 696
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 691 - 696
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বিশ শতকের প্রথম আলোয় বঙ্গনারী : প্রেক্ষিত এপার বাংলা ওপার বাংলা

দিলরুবা খাতুন
গবেষক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : kdilruba91s@gmail.com

ও

ড. কাকলি ধারা মন্ডল
অধ্যাপিকা, লোকসংস্কৃতি বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : kakali.ku.folklore@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Bengali women, patriarchy, oppression, women education, reformation, etc.

Abstract

In the early 19th century, Bengali women lived in a dark societal context, influenced by patriarchal norms and traditional practices that marginalized their rights and freedoms. Despite some educational advancements, many educated women still supported oppressive traditions, such as widowhood customs, reflecting the deep-rooted societal norms. The push for women's education gained momentum, especially after the partition of Bengal, leading to the establishment of many schools for refugee women, which significantly altered their educational landscape. The continuation of arranged marriages and the lack of agency for women in choosing their partners, revealing the entrenched societal norms that persisted into the 20th century. Women played a crucial role in the nationalist movements, although their contributions were often overlooked by male leaders, emphasizing the need for recognition of women's agency in historical contexts. The partition of India led to significant upheaval, with many women facing violence and displacement, which further complicated their social status and rights. This paper, by reviewing several literature as primary data source and secondary data source, discusses in detail the aforementioned issues, challenges and fights of the women in Bengal and finally concludes by noting that the refugee women from East Bengal brought about a transformative change in societal perceptions of

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 76
Website: https://tirj.org.in, Page No. 691 - 696
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

women, leading to greater independence and self-reliance in the post-partition era.

Discussion

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বঙ্গনারীর অবস্থান ছিল অন্ধকারময়। দ্বিতীয়ার্ধে তাদের জীবনে আলো-আঁধারের খেলা সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রভাবে। বিশ শতকের প্রথম চার দশকে আলোর আবির্ভাব। ৪০-এর দশক থেকে অতি দীপ্য। বিশ শতকের সূচনা থেকেই বঙ্গসমাজ সামাজিক প্রথাগুলি মোচন ও অমোচন এর দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিল, কারণ উনিশ শতকের ধ্যানধারণার প্রলম্বিত ছায়া তখনও অনেকটা ঢেকে রেখেছিল সমাজ মননকে। পিতৃতন্ত্রের কাঠামো তখনো বেশ মজবুত। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় পিতৃতন্ত্রের স্বৈরিতাকে পরোক্ষ সমর্থন করেছিলেন কোন কোন বিশিষ্ট মহিলা। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর মতো শিক্ষিতা আধুনিক মনস্ক মহিলা লিখেছিলেন, -

> "পুরুষেরা জেনে বুঝে যে মেয়েদের উপর অত্যাচার অবিচার করবার জন্যই অন্যায় আইন প্রণয়ন করেছে বা আচার প্রবর্তন করেছে তা আমি বিশ্বাস করিনে।"[১]

সেজন্য বিশ শতকের অন্তত প্রথম তিনটি দশকে দেখা যায় অত্যাচারিতা নারী সমাজের বিবর্ণ ছবি।

নারী সম্পর্কে উনিশ শতকের মনোভাব বিশ শতকের অনেকখানি সময় জুড়ে অটুট ছিল। আশাপূর্ণা দেবী হতাশার সুরে লিখেছিলেন, -

> "এখন অনেক কিছু বদলেছে কিন্তু মনোধর্ম তেমন বদলাইনি।"[২]

উনিশ-বিশ শতকের বিশিষ্ট নারীবাদী কৃষ্ণভাবনী দাস আট বছর বিলেতে কাটিয়ে এসেও অগ্রাহ্য করতে পারেননি বিধবার সংস্কার। বিধবা হওয়ার পর নিজ নিষ্ঠার সঙ্গে বৈধব্য পালন করেন, সমর্থন করেছিলেন সেই সংস্কার অতিসাধারণ অনালোকিত নারীর মতো। স্বাধীনতা লাভের প্রায় একদশক পরেও বিধবাদের ওপর কড়া বিধি-নিষেধ কিভাবে চাপিয়ে দেওয়া হত বাণী বসু তার 'শ্বেত পাথরের থালা' (১৯৯০) উপন্যাসে দেখিয়েছেন ২৭ বছরের বন্দনা বিধবা হলে। বিধবা বিবাহ আইন পাশ হওয়ার অর্ধ শতাব্দী পেরিয়ে গেলেও বঙ্গ সমাজে ভ্রু কুঞ্চিত হত বিধবা বিবাহের কোন ঘটনা শুনলে। বিশ শতকের শেষ লগ্নেও বঙ্গসমাজ বিধবা বিবাহ নিয়ে যে এক অদ্ভুত দোলাচলে ছিল তা স্পষ্ট।

উনিশ শতকের ধারা বজায় রেখে বিশ শতকে কন্যাসন্তানের জন্মকে মনে করা হতো পরিবারের পক্ষে অভিশাপ। কেবল পণ প্রথার চাপে নয় পূর্ব সংস্কারের প্রভাবেও। সন্তান সম্ভবা মহিলা প্রথম সন্তানের জন্মের পূর্বে আকুল হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন, যেন পুত্র সন্তানের জননী হতে পারেন। সেই সৌভাগ্যের ওপর নির্ভর করতো শ্বশুরবাড়িতে তাঁর আদর যত্ন সম্মানের প্রশ্নটি। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে শিক্ষিত পরিবারগুলি বাল্যবিবাহে তেমন উৎসাহ বোধ না করলেও ১৯৮৭ সারদা বিলে মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স বৃদ্ধির প্রস্তাব দিলে ঝড় ওঠে প্রতিবাদের। এই বিল পাস হওয়ার (১৯২৯) পরও অনেকে সমর্থন করে গিয়েছিলেন বাল্যবিবাহ। এই একুশ শতকেও বালিকা বিবাহ বিরল নয়, এটা একটা সামাজিক সমস্যা রূপে বিদ্যমান।

সমাজ সংস্কারের প্রভাবে স্ত্রী শিক্ষার বিরুদ্ধে সুর কিছুটা নরম হলেও একেবারে মিলিয়ে যায়নি। মধ্যবিত্ত পরিবারের স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে অনেকেই উপলব্ধি করতে পারেনি স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। তাদের প্রশ্ন ছিল একটাই, লেখাপড়া শিখে কি মেয়েরা চাকরি করবে? শিক্ষা যে কেবল চাকরির জন্য অপরিহার্য নয় একথা তাদের মনে হয়নি একবারও। সমাজের প্রগতি যে নারী শিক্ষার ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল তা বুঝতে সময় লেগেছিল অনেক। পুরুষের ভয় ছিল লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা মানবে না পুরুষের কর্তৃত্ব। স্বাধীনচেতা হয়ে উঠবে, আলগা হয়ে যাবে পুরুষতন্ত্রের ভিত। আর মায়েদের দুশ্চিন্তা ছিল লেখাপড়া জানা মেয়ে, শ্বশুর বাড়ি গিয়ে অগ্রাহ্য করবে পারিবারিক অনুশাসন, যার পরিণতি অশান্তি। তবে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের জন্য শতাব্দীর প্রয়াস যেখানে পূর্ণ সাফল্য পায়নি, দেশভাগের পর উদ্বাস্তুরা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 76
Website: https://tirj.org.in, Page No. 691 - 696
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তাদের কলোনিতে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে স্ত্রী শিক্ষার ছবিটা একেবারে পাল্টে দিয়েছিল এক দশকের মধ্যে। ১৯৪৯-১৯৫৫ এর মধ্যে উদ্বাস্তু কলোনিগুলোতে গড়ে উঠেছিল ৩৪০টা স্কুল। ১৯৬০-৬১ তে তার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩৮৫ টা।[৩] পশ্চিমবঙ্গের মেয়েরা দেখল পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু মেয়েরা কি দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে শিক্ষা জগতে। তবে অস্বীকার করা যায় না তাদের লেখাপড়া শেখার তীব্র অনুপ্রেরণার উৎস ছিল, অর্থনৈতিক সংকট এবং মূল উদ্দেশ্য ছিল অর্থ উপার্জন করে স্বনির্ভর হওয়া।

বিশ শতকেও বাঙালির অন্দরমহলের ছবিটা খুব একটা বদলায়নি। মেয়েদের জীবনে আরোপিত নিয়ম কানুনে উনিশ শতকের প্রভাব স্পষ্ট। নারীর আদর্শ স্থান ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে। পুরুষের জগত বাইরে, নারীর অন্তঃপুরে, এই ভাবনা থেকে অধিকাংশ পুরুষ বেরিয়ে আসতে পারেনি বিশ শতকেও। ইচ্ছে করেই পুষে রেখেছিল এই ভাবনা, দুটো কারণে - প্রথম নারীর প্রতি পুরুষের যুক্তিহীন অবিশ্বাস; দ্বিতীয়, বাইরের জগতের আলোর স্পর্শে এলে তাদের চোখ ফুটবে, পুরুষের কর্তৃত্বে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবে এই আশঙ্কা। অবরোধ প্রথার শিকার হয়েছিল হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত বঙ্গনারী। তাই এই প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল হিন্দু মুসলমান উভয় নারী সমাজ। শিক্ষিত হিন্দু মেয়েদের মতো মুসলমান বিদুষীরাও মেনে নিতে পারেননি অবরোধ প্রথা। ব্যক্তিগত জীবনে অবরোধ প্রথার তিক্ত অভিজ্ঞতা বেগম রোকেয়াকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এই প্রথার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে। তার সঙ্গে গলা মিলিয়েছিলেন বেশ কয়েকজন সংস্কার মুক্ত মুসলমান মহিলা।

উনিশ শতকে বঙ্গ সমাজে যে বিবাহ প্রথা ছিল তাকে আঁকড়ে রেখেছিল বিশ শতকেও। এই শতকেও কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বিয়ে হত সম্বন্ধ করে। সেই বিয়েতে পাত্র-পাত্রীর পছন্দ-অপছন্দ ছিল মূল্যহীন। ছেলে মেয়ের বিবাহ বন্ধনের পরিবর্তে গুরুত্ব পেত দুই পরিবারের বন্ধন। তবে একটা বড় পরিবর্তন ঘটে যায় সম্বন্ধ করা বিয়েতে। উনিশ শতকের শেষের দিকেও ছেলে মেয়ের বিয়েতে ঘটকের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বিয়ের সম্বন্ধ আনা থেকে বিয়ের সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে পত্রপত্রিকাগুলি বিয়ের বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে ঘটকের বিকল্প হয়ে উঠলে ক্রমশ দাম কমল তাদের পেশায়। তাছাড়া ২০ শতক এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভাব ঘটতে থাকলো রোমান্টিক প্রেমের বিয়ের যেখানে পাত্র-পাত্রী ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তির মাথা গলাবার সুযোগ নেই। তথাপি সম্বন্ধ করে বিয়ে দেওয়ার কথা যে বাতিল হয়ে যায়নি এই একুশ শতকেও তার প্রমান খবরের কাগজগুলোতে প্রকাশিত রাশি রাশি বিজ্ঞাপন এবং অগুনতি বিবাহ প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব।

সম্বন্ধ করে বা পূর্বরাগে বাধা পড়ে যেভাবেই বিয়ে হোক না কেন শুরুতেই দাম্পত্য জীবন ছিল মেয়েদের কাছে এক অন্যরকম যুদ্ধক্ষেত্র। একান্নবর্তী যৌথ পরিবার যদি বেজায় রক্ষণশীল হতো তাহলে নববধূর কপালে দুঃখের সীমা থাকত না। নববধূর দাম্পত্য জীবন উপভোগে পথের কাঁটা ছিল একদিকে করা পারিবারিক নিয়ম-কানুন অন্যদিকে বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাদের সতত নজরদারি। এ অভিজ্ঞতা হয়েছিল আশাপূর্ণা দেবীর 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসের সুবর্ণলতার।

বিশ শতকের প্রথমার্ধেও পুরুষ সমাজ মেনে চলছিল লিঙ্গবৈষম্যের তত্ত্ব। তাদের ধারণা ছিল নারী জাতি কখনো তাদের সমকক্ষ হতে পারে না। তাই তাদের স্বাধীনতার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু মেয়েদের দাবিটা ছিল ভিন্ন রকম। বেগম রোকেয়া দাবি করেন –

> "স্বাধীনতা অর্থে পুরুষের ন্যায় উন্নত ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে।"[৪]

বিশ শতকে নারীর স্বাধীনতা নিয়ে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য খুব স্পষ্ট ছিল না। অনেকের মতে রবীন্দ্রনাথও ব্যতিক্রম নন। মেয়েদের স্বাধীনতা নিয়ে ঠাকুর পরিবারের মেয়েদের ভাবনাও অভিন্ন ছিল না। তবে অস্বীকার করা যায় না বিশ শতকে নারী স্বাধীনতার অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন ঠাকুর বাড়ির স্বর্ণকুমারী দেবীর মেয়ে সরলা দেবী। বিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধেও কোন কোন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ সমর্থন করতে পারেননি উপার্জন করে মেয়েদের স্বনির্ভর হওয়ার স্বাধীনতাকে। নীরদ চন্দ্র চৌধুরী (১৮৯৭-১৯৯৯) ছিলেন মেয়েদের চাকরি করার প্রবল বিরোধী।[৫]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 76
Website: https://tirj.org.in, Page No. 691 - 696
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিশ শতকে বঙ্গ নারীর পরিচয় ছিল নিরন্তর পরিবর্তনশীল।[৬] বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে নেতারা মেয়েদের সহযোগিতা চেয়েছিলেন আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য। ভারতীয় নারীর পরম্পরীন আদর্শকে তুলে ধরেছিলেন সুকৌশলে। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামকে পরিণত করা হয়েছিল মাতৃভূমির পূজা রূপে, ভারত হয়েছিল ভারত মাতা। উদ্দেশ্য ছিল নারী সমাজের ভাবাবেগকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের কাজে লাগানো। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণে বাধা দেওয়া হয়েছিল তাদের। জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে দু-চারজন নারী উপস্থিত থাকলেও তাদের কোন ভূমিকা ছিল না। কংগ্রেসের নীতি নির্ধারক কমিটিতে তাদের স্থান তো দূরের কথা, অনুমোদন দেওয়া হত না তাদের সমস্যা উত্থাপনেও। জাতীয় নেতাদের বক্তব্য ছিল নারীর আদর্শ ভূমিকা জায়া ও জননীর। উপযুক্ত স্থান গৃহকোণ। রাজনৈতিক প্রাঙ্গণ তাদের জন্য নয়।

লবণ সত্যাগ্রহের আগে পর্যন্ত গান্ধীজী ছিলেন এই ধারণার অংশীদার। এ কথা উল্লেখযোগ্য যে গান্ধীবাদী আন্দোলন নারীকে ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রতিমূর্তি রূপে তুলে ধরেছিল। যারা বিদেশী শাসকের বর্বর শক্তির রূপান্তর ঘটাবে অহিংস পথে অবিচলিত থেকে। নারীর গান্ধী মডেল আরোপ করা হয়েছিল পবিত্রতা সততা এবং কর্তব্য পরায়ণতা। এইরকম আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নারী একদিকে পুরুষের উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী হয়ে পরিবারের দাসত্ব সামলাবে, অন্যদিকে প্রয়োজনে কাজ করবে দেশের জন্য।[৭] তবে অনেক নারীর এ রূপের সমর্থক ছিলেন না। তারা চেয়েছিলেন সেই নারী যারা তেজস্বিনী নির্ভীক। সুভাষচন্দ্র মমতাময়ী সীতাকে চাননি চেয়েছিলেন শক্তিময়ী ঝাঁসির রানীকে।[৮] তিনি নারী সমাজকে ভাগ করেছিলেন দুই ভাগে ভগিনী ও মাতা। ভগিনীরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করবে প্রত্যক্ষভাবে মায়েরা তাদের সমর্থন করবে পিছন থেকে।

নারী সমাজ জেগে উঠেছিল স্বদেশী আন্দোলনের হাত ধরে। তাদের কাছে স্বাধীনতা সংগ্রাম এক ভিন্নমাত্রা পেয়েছিল নারী মুক্তির ধাত্রী হিসেবে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়েই স্বাধীনতার চিন্তা ও আত্ম উপলব্ধির প্রথম স্বাদ গ্রহণ করে নারী সমাজ। কিন্তু বঙ্গ নারীর এই ভাবনাকে গুরুত্ব দেননি জাতীয়তাবাদী নেতারা। এমনকি গুপ্ত বিপ্লবী দলগুলি পর্যন্ত প্রথম দিকে মেয়েদের দলভুক্ত করতে চাননি, যদিও বেশ কিছু সংখ্যক মেয়ে ভীষণ আগ্রহী ছিলেন বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্রিটিশ বিরোধী অভিযানে অংশগ্রহণ করতে। অনেক চেষ্টা করে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার অনুমতি লাভ করেন করেছিলেন চট্টগ্রামে ইউরোপীয়দের ক্লাবে সশস্ত্র অভিযানে অংশ নিতে। চল্লিশের দশকে জাতীয় আন্দোলনের প্রকৃতির রূপান্তর ঘটলে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের সব বাধা সরে যায় মেয়েদের সামনে থেকে। কমিউনিস্ট পার্টির দরজা অবশ্য বন্ধ ছিল না মেয়েদের কাছে। সাম্যবাদীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক শিক্ষিত মেয়ে আত্মনিয়োগ করেছিলেন দেশের কাজে পার্টির কাজে। ১৯৪৬ এর তেভাগা আন্দোলনে কমিউনিস্ট মহিলাদের ভূমিকা ছাপিয়ে যায় পুরুষদের। কমিউনিস্ট পার্টি এই আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণে তেমন আগ্রহ দিল না। তথাপি মহিলারা এই লড়াইয়ে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে প্রাণ দেয় পুলিশের গুলিতে।

বিশ শতকের চল্লিশের দশকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা স্বাধীনতা এবং দেশভাগ এই তিনটি অভিঘাত বঙ্গনারীর জীবনে এনেছিল অভূতপূর্ব অচিন্ত্য বৈপ্লবিক পরিবর্তন। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের কাছে স্বাধীনতা ছিল অভিধা কারণ তাদের কাছে স্বাধীনতা আশীর্বাদ না হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল অভিশাপ রূপে। স্বাধীনতার অপর পিঠে দেশভাগ। স্বাধীনতা না হলে দেশ ভাগ হত না দেশভাগ না হলে হারাতে হত না বাস্তভিটে, ত্যাগ করতে হত না জন্মভূমি। ১৯৪৬ এর নোয়াখালী ও টিপে রাজধান দাঙ্গা ছিল পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের কাছে অশনি সংকেত। এই দাঙ্গার পরিণামে অসংখ্য হিন্দু নারী ধর্ষিত হয় অপহৃত হয় বাধ্য হয় ধর্মান্তরিত হয়ে বিয়ে করতে। কিন্তু যেসব হিন্দু মেয়ে অপহৃত হয়ে উদ্ধার পায় তাদের জীবনে ঘনিয়ে আসে চরম বিড়ম্বনা। তারা পরিত্যক্ত হয় নিজের পরিবার ও সমাজের দ্বারা। নিক্ষিপ্ত হয় অনিশ্চিত ভবিষ্যতে। হারায় আত্মপরিচয়। ক'জনই বা জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসের সুতারার মতো জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়ে তৈরি করে নিতে পেরেছিল নিজের আত্মপরিচয়?

ছেচল্লিশের এর দাঙ্গার পর শুরু হয়ে যায় পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুদের গণপ্রবার্জন। এরপর স্বাধীনতা এল কিছুদিন পরে দেশভাগ ধর্মের ভিত্তিতে। সিভিল র‍্যাডক্লিফের কলমের আচরের দাগ দেশের মাটিতে পড়েনি, পড়েছিল পূর্ববঙ্গের লক্ষ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 76
Website: https://tirj.org.in, Page No. 691 - 696
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লক্ষ হিন্দুর বুকের পাঁজরে। যাদের দেশ ছেড়ে নড়তে হয়নি, দেশভাগ তাদের দিয়েছিল স্বাধীনতা। আর যারা নিজভূমে পরবাসী হয়ে দেশ ত্যাগ করে তাদের দিয়েছিল উদ্বাস্তু তকমা। পশ্চিমবঙ্গের অনেক মানুষের কাছে প্রথম দিকে হয়ে উঠেছিল প্রায় অপরাধীর সমার্থক।

ইসমাত চুঘতাই লিখেছেন, সেদিন দেশটাই কেবল দুটো শরীরে বিভক্ত হয়নি বিভক্ত হয়েছিল মনটাও।[৯] একেবারে খাঁটি কথা। দেশভাগের আগে পূর্ববঙ্গে হিন্দু মুসলমান ছিল একটা মনের দুই শরিক। তাদের সুসম্পর্ক সবক্ষেত্রে পৌঁছে দিয়েছিল আত্মীয়তার পর্যায়ে। মণিকুন্তলা সেন লিখেছেন মুসলমান দুধওয়ালা রান্নাঘরের দাওয়ায় একটু জিরিয়ে নিয়ে জল চাইলে তার মা ঘরে যা থাকতো দিতেন। সে খুশি হয়ে খেত তারপর দুধের কলসিটা উপুড় করে দিত একটা কড়াইয়ে। তার মা বাধা দিলে সে বলত, - "ভাবেন না মাঠাইরেন আপনার পোলাডায় দিছে।"[১০] এক ভিন্নধর্মী মহিলার সঙ্গে মা ছেলের সম্পর্ক গড়ে তুলতো নির্দ্বিধায়।

হিন্দু মুসলমানের এই একটা মন প্রায় রাতারাতি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল দেশভাগের ফলে, পূর্ব বাংলা পাকিস্তান বলে ঘোষিত হওয়ার পরই। পূর্ব বাংলার মুসলমানরা মনে করল সেই দেশটা কেবল মুসলমানেরই হিন্দুদের কোন জায়গা নেই। তবে সব দোষটা তাদের নয়। আসলে পাকিস্তান সরকারের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি পূর্ব বাংলার মুসলমানদের সাদা মনে ছিটিয়ে দিয়েছিল সাম্প্রদায়িকতার কালো কালি। অমনি শুরু হয়ে গেল হিন্দু নারী নিগ্রহ। এই ঘৃণ্য ঘটনাকে অনেক মুসলমান পুরুষ দোষাবহ বলে মনে না করলেও মুসলমান মেয়েরা সমর্থন করতে পারেননি তাদের। জ্যোতির্ময় দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসে তমিজদ্দিন সাহেবের স্ত্রী তার স্বামীকে প্রশ্ন করেছেন –

> "তোমাদের দেশভাগ চাই, ঝগড়া করবে কর, আমাদের মেয়েদের মান ইজ্জত শরীর নিয়ে এ লাঞ্ছনা কেন? কোরআনে আছে?"[১১]

বস্তুত ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ পুরুষ সমাজে বিভেদের প্রাচীর তুলে দিলেও তেমনটা কিন্তু হয়নি নারী সমাজে। একজন মুসলমান নারী একজন হিন্দু নারীকে নিজের মতো করে একজন নারী হিসেবে দেখেছেন, হিন্দু নারী রূপে নয়। তারা বঙ্গনারী হয়ে উঠেছেন, মুসলমান নারী হয়ে পৃথক পরিচয়ে নয়।

দেশভাগ হল, লক্ষ লক্ষ মানুষ ছিন্নমূল হয়ে চলে এল এ বঙ্গে। কংগ্রেস সরকার প্রথমে তাদের উদ্বাস্তু বলে মানতে চাইল না। তাদের মনে হল পূর্ববঙ্গ থেকে এভাবে স্রোতের মতো উদ্বাস্তু চলে আসার মত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি সেখানে। সবটাই বানানো গল্প আর খবরের কাগজগুলোর মিথ্যে রটনা। কিন্তু অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছালো যে সরকার বাধ্য হল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে উদ্বাস্তু শিবির খুলতে। চরম অব্যবস্থা সরকারি অবহেলায় সেই শিবিরগুলো নরককে হার মানালো। বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা তানভীর মোকাম্মেল লিখেছেন, -

> "কুপার্স ক্যাম্প, ধুবুলিয়া ক্যাম্প, ভদ্রকালিকা, যাদবপুর ক্যাম্প ও মানা ক্যাম্পে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা দেখেছি নারী উদ্বাস্তুদের যারা অনেকেই বৃদ্ধা ও অসহায়... উদ্বাস্তু ক্যাম্প ঘুরলে বোঝা যায় সাতচল্লিশের দেশভাগ কত অসংখ্য পরিবারের জীবনকে কত নিষ্ঠুর ভাবে তছনছ করে দিয়েছিল... দেশভাগ দু তিনটে প্রজন্মের জীবনকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছে, নষ্ট করে দিয়েছে তাদের মানবিক সম্ভাবনা গুলোকে।"[১২]

উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা উদবাস্তুদের বাধ্য করে কলকাতার উপকণ্ঠে সরকারি ও ফটকাবাজদের পতিত জমি জবরদখল করে মাথা গোজার ঠাই তৈরি করতে। জমি দখলের প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করলেন উদবাস্তু মহিলারা। গড়ে উঠলো কয়েকটা উদ্বাস্তু কলোনি। ওদিকে পুলিশ ও জমির মালিকের ভাড়া করা গুন্ডারা তাদের উচ্ছাদ করার জন্য হামলা চালায়। পিছিয়ে গেল না উদ্বাস্তুরা। মহিলারাও মরণপণ লড়াই চালালেন, প্রাণ দিলেন পুলিশের গুলিতে দ্বিতীয়বার বাস্তুহারা না হওয়ার জন্য। এ লড়াইটা তারা পূর্ববঙ্গে চালাতে পারেনি দুটো কারণে, প্রথম সেখানে তারা ছিলেন সংখ্যালঘু, পুলিশ বা কিছু গুন্ডার বিরুদ্ধে লড়াই করা আর একটা গোটা সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক হিংসার বিরুদ্ধে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 76
Website: https://tirj.org.in, Page No. 691 - 696
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লড়াই করা এক নয়। একেবারেই অসম্ভব। দ্বিতীয়, এ বঙ্গের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার যে সুযোগ পেয়েছিলেন পূর্ববঙ্গে তা পাওয়া যায় নি। উদ্বাস্তু অবস্থায় ভিটেহারা নারীদের এক তরুণ চিত্র আমরা দেখতে পায় অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'নির্বাস' উপন্যাসে।

উদ্বাস্তুরা কলকাতার সাবেকি ভদ্র সংস্কৃতিতে ঘটায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বিশেষ করে নারী সমাজে কলকাতার এত দিনের সুশীল শান্ত নারী সমাজে কাঁপন ধরিয়ে দিল পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারা মধ্যবিত্ত মেয়েরা। তাদের রাজপথে দেখা গেল চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে। বেঁচে থাকার জন্য তারা বাধ্য হল পুরুষের পেশা গ্রহণ করতে। তবে এ কাজে মিশেছিল গ্লানি ও গৌরব একসঙ্গে। দেশভাগের পরিনামের শ্রেষ্ঠ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব বঙ্গ নারীর ভাবমূর্তিতে ঘটিয়েছিল পরিবর্তন। তারা সক্ষম হয়েছিল আত্মনির্ভরশীল হতে। বস্তা পচা সামাজিক বিধি নিষেধ অমান্য করতে। ফলে দেশভাগের ধ্বংস স্তুপের মধ্য থেকে ফিনিক্স পক্ষীর মত বাংলায় আবির্ভাব ঘটল এক নতুন নারী সমাজের। বঙ্গনারীর এই নতুন রূপ ছিল আগামী প্রজন্মের বঙ্গনারীর দিশারি।

Reference:

১. চৌধুরানী, দ. ই. (চৈত্র ১৩৩৫). সমাজে নারীর সত্য অধিকার. বঙ্গলক্ষী, ৩১৮

২. দেবী, আ. (১৪২৬). আর এক আশাপূর্ণা. কলকাতা, পৃ. ১৭

৩. Nandy, U. (2019, December). The Refugee Women in West Bengal and it's influence on Bengali culture. International Journal of Research in Engineering, Science and Management, 2 (12), P. 581-585

৪. বেগম, র. (২০০৬). রোকেয়া রচনাবলী. ঢাকা: বাংলা একাদেমি

৫. আইয়ুব, গ. (২০০১). গত ৫০ বছরে কলকাতার মেয়েরা. In আনন্দ সঙ্গী, প্রথম প্রবন্ধ, আনন্দবাজার পত্রিকা সংকলন, কলকাতা, পৃ. ৩০১

৬. Ghosh, S. (2007). Becoming a Bengali Woman: Exploring Identities in Bengali Women Fiction, 1930-1955. School of Oriental and African Studies, University of London.

৭. Ghosh, S. (2007). Becoming a Bengali Woman: Exploring Identities in Bengali Women Fiction, 1930-1955. School of Oriental and African Studies, University of London.

৮. Ghosh, S. (2007). Becoming a Bengali Woman: Exploring Identities in Bengali Women Fiction, 1930-1955. School of Oriental and African Studies, University of London.

৯. Ismat, C. (2004). Communal Violence and Literature. In R. M. edition, No Women's Land, New Delhi. p. 40

১০. সেন, ম. (২০১০). সেদিনের কথা. In ম. সেন, জনজাগরণে নারী জাগরণে : জন্মশতবার্ষিক রচনাসংগ্রহ. কলকাতা : থীমা, পৃ. ১৫

১১. দেবী, জ. (২০২০). জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন (খন্ড 1). কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং

১২. মোকাম্মেল, ত. (২০১৬). দেশভাগ সীমান্ত রেখা ঘটিয়েছে সমূহ সর্বনাশ, (অ. বিশ্বাস, Ed.) কলকাতা : গাঙচিল